



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 335 - 342

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নারী ও সমাজের দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব : তসলিমা নাসরিনের কলমে

বৈশাখী দাস

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির বি.এড, ডি.এল.এড, এম.এড কলেজ

Email ID : Baishakhid32@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Feminist,
women's equality,
religious
fundamentalism,
emancipation of
women.

Abstract

In Bengali literature, female poets and writers have always raised their voices for the freedom of the women against various Social Prejudices and evil customs. Various incidents of real life have emerged in their writings. One such feminist writer is Taslima Nasreen who has pointed out the decaying Social system of the dark Society. Taslima Nasreen written a lot for the marginalized people and the people of the third gender. Women's equality have found a permanent Place in her works. Her criticism on women oppression, religious, religious fundamentalism is remarkable and she Made a vociferous protest against all traditions fearlessly. For this she had to endure many insults and humiliations. A man's forcible access to a women's body treating them as a Commodity tormented Taslima Vehemently. The rationalistic Taslima wanted women to create their own life history. Women's their thoughts, their dress habits, their life style and even their food will be their own. Taslima wanted that like Mother Earth a women will be all enduring and all powerful. Over the rotten Sores that pervade every Stratum of Society, women will march forward fearlessly as Goddesses. Taslima's sharp eriticism makes her writing style lively and vibrant, which is enough to unmasu the disguised future Society. Her work is a living document in exposing the hypocrisy of the Society and So-called civilized Society along women centric issues. Instead of Moving towards entertaining the readers her pen repeatedly finds the way to build a perfect Society through the emancipation of women.

Discussion

ভূমিকা : বিশ্ব পৃথিবীর সমাজ বড় অঙ্কুত, এখানে লিঙ্গ অনুযায়ী অর্থাৎ 'নারী' 'পুরুষ' জনিত শব্দের ভেদাভেদ অসীম, সমাজ এবং তথাকথিত সমাজপযোগী মানুষ এর সৃষ্টি কিংবা উদ্ভবের যেমন কোনো সনতারিখ নেই, তেমনি 'নারী' শব্দটির সৃষ্টি কিংবা কবে থেকে নারীদের পরিচিতি পুরুষের একাধিপত্য এবং ছত্রছায়ায় তলে নিমজ্জিত তার কারণ কিংবা যৌক্তিকতা কেউই দেখাতে পারেনই। সমাজ পরিবর্তনের জটাজালে নারীরা ক্রমশ আটকে পড়েছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পারি অনেক সংস্কৃতিতেই নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত। ক্ষমতা বা অর্থপ্রদানকারী পেশা

বা ভূমিকায় নারীরাই প্রায়শই ছিল বঞ্চিত। সমাজে সৃষ্ট নাগরিক হিসাবে ভোটদানের অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। নারীলিঙ্গকে একটি অধস্তন শ্রেণী-হিসেবে দেখা হত, যা পুরুষদের একটি প্রভাবশালী শ্রেণীর দ্বারা ছিল পরাধীন। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় ঘেরাটোপে নারীর কর্তৃত্ব হারিয়ে যাওয়ার গল্প আমরা অনেক দেখতে ও জানতে পারি। প্রাথমিক বৈদিক যুগে নারীদের সম্মান করা হত এবং সমাজে তাদের একটি স্থান ছিল, স্বয়ংস্বর ব্যবস্থার মাধ্যমে মেয়েদের স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পরবর্তীযুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকল। শিক্ষা, স্বাধীনতা, সমাজ থেকে তাদের বহিষ্কার করে, ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সামাজিক নিয়মের বেড়া জালে আবদ্ধ করে রাখা হল। পরবর্তী পর্যায়ে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ এবং বিধবাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের জীবন্ত দলিল আমরা পেয়েছি। সেখান আলোর পথে দিশা দেখিয়েছিলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, লর্ড বেন্টিক কিংবা বেথুনের মত সমাজ সংস্কারক, যারা নারীদের ওপর ঘটে যাওয়া চির প্রচলিত অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন। নানা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা রদ করার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহান পুরুষ বলেছিলেন, যে সমাজে নারীর স্বাধীনতা নেই, সেই সমাজ অগ্রসর হয় না, তৎকালীন সমাজ সংস্কারকরা চেয়েছিলেন নারীকে স্বাধীন করতে, বিশ্বদরবারে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে। নারীকে শিক্ষিত করে সমাজে যোগ্য নাগরিক করে তুলতে, যা সত্যই প্রশংসনীয় এবং উল্লেখ্যের দাবী রাখে।

নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গ এলে তার সাথে চলে আসে আর একটি প্রসঙ্গ যাকে বলা নারীবিদ্যা,- মানবীবিদ্যা অথবা Feminism। এই নারী বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হল— নারীদের শিক্ষা, প্রগতি, স্বাধীনতা, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবদানের দিক তাদের বিষয়সমূহ নিয়ে পঠন পাঠন, গবেষণা, আলোচনা করা অর্থাৎ এক কথায় নারী ইতিহাসের চর্চার ধারাটিকে বলা হয় Feminism। এই Feminism শব্দটির সাথে আর একটি শব্দ আবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত যাকে বলা হয় নারীবাদ। নারীবাদ হল নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা ও সমান অধিকারের মতবাদ। নারীদের ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার, এছাড়াও সমাজে নারী পুরুষের সমান দাবি থেকে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই নারীবাদী আন্দোলনের ধারা ছিল বিভিন্ন। এই নারীবাদী আন্দোলন এর ধারা সমাজ সংস্কারকদের মননে নারী ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছিল। বৌদ্ধ যুগে নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার রক্ষিত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণবাদের প্রভাবে বাংলার নারী সমাজের জীবনকাল তিনটি পর্যায়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যকালে সমাজের মধ্যে নারীদের জীবনকালকে আবদ্ধ রূপ প্রদান করা হয়েছিল। মনুসংহিতা অনুসারে পিতৃ গৃহে বসবাসের সময়কাল, স্বামীগৃহে বসবাসের সময়কাল এবং পুত্র সন্তানের গৃহে বসবাসের সময়কাল। এহেন নারীর দুরাবস্থা, সমাজে তাদের সঙ্কুচিত অবস্থানের চিত্রের ধারা বিভিন্ন সাহিত্যে, পুস্তিকায় কিংবা পত্র পত্রিকায় পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক প্রোথিতযশা সাহিত্যিক রয়েছেন যারা ‘নারী’ শব্দটির রূপকে যথেষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের লেখনীর কলমে।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নানা পুরুষ সাহিত্যিকের কলমে নারী বিভিন্ন অবয়বে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু শুধু পুরুষ নয়, এমন অনেক নারী সাহিত্যিক আজও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন যাদের লেখনী ধারা ‘নারী’ শব্দটি যেন ক্রমশ বিকশিত প্রস্ফুটিত। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকদের লেখনী শৈলীতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রকাশ পাওয়া যায়। বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের নামও উল্লেখযোগ্য। সংসার জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, স্বামী-পুত্র-কন্যা সন্তানদের দায়িত্ব বজায় রেখে নারীরা কিভাবে মুখোশ পরা সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে তার মূর্ত প্রমাণ পাই তাঁদের লেখনী ধারায়। এমনি আর একজন নারীবাদী লেখিকা হলেন তসলিমা নাসরিন। এই বাংলাদেশী লেখিকার কলমের বিষয় ছিল নারী নির্যাতন, ধর্মের সমালোচনা, ইসলামিক কোডের বিরুদ্ধে শুষ্ক ডায়ট্রিবিস, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখনীর দ্বারা তিনি সমালোচিত হয়েছেন, তিনি বোরখা পরিহিতা নারীকে ‘চলমান কারাগার’ এবং ‘আত্মঘাতী বোমা’ হিসাবে অভিহিত করেন। তাঁর মনোভাব, মনের জোর, সমাজের নেতীবাচক দিকের উন্মোচন, সোজা সাপ্টা কথাবলা প্রভৃতি কারণে মুসলিম সমাজের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শত্রু।

এমনকি অনেকে তাঁর ফাঁসির ছকুম দিতেও পিছপা হয়নি। বাংলা সাহিত্যে ‘বেগমরোকেয়া কিংবা মল্লিকা সেনগুপ্ত যে নারীবাদের চর্চা করেছিলেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তেমনি তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় আরও তীব্র ও স্বচ্ছরূপে। তাঁর লেখা রচনাগুলি হয়ে উঠেছে পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসন ও ধর্মীয় মৌলবাদ। তাঁর সাহিত্যের স্থান পেয়েছে প্রান্তিক মানুষ, তৃতীয় লিঙ্গ ও নারীর সমানাধিকারের কথা। যে যৌনতার আধারে পুরুষ লিঙ্গের দাপটে কামনার তাগিদে নারীরা হয়ে উঠেছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। সেই যৌনতার হাত ধরে তসলিমা নারী মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, -

“অভিধানে পুরুষ শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে মানুষ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও নারীর সমার্থক শব্দ হিসাবে মানুষ শব্দটি উল্লিখিত হয় না। সুধীজন সমাদৃত এই অভিধানগুলিতে নারীদেরকে ‘মানুষ’ বা পুরুষের সমগোত্রীয় বলে গণ্য করা হয় না।”^১

তিনি তাঁর লেখনী ধারার ক্ষুরধার যৌক্তিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহচর্যে এমন কিছু রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন যা সত্যই কুর্নিশ কিংবা প্রশংসার দাবী রাখে। সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য তাঁর জীবনযাত্রায় জন্মভূমি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ভবঘুরে জীবনযাত্রা কাটালেও, তিনি তাঁর যৌক্তিক লেখনী ধারাকে কোনো দিন থামতে দেননি, তাঁর লেখনী ধাবায় আছে এক অসম্মান্য জেদ। যা নিজেকে বারে বারে প্রমাণ করে দিচ্ছে নারীর আসল অস্তিত্বের কথা। সাহিত্যিকের দরবারে তিনি কোথাও হয়েছেন অপমানিত, কোথাও সমালোচিত আবার কোথাও প্রশংসিত। কেউ কেউ তাকে সাহিত্যের রসধারার সুন্দর মহলে বসবাস করতে দেয় না। কিন্তু তাতে তাঁর কিছু এসে যায়না, তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর হৃদয়ান্ত্রিত সাহিত্যের রসধারা যেখানে তসলিমা নাসরিনের অনুরক্ত পাঠকপাঠিকারা অভিভূত। তাঁর সাহিত্যের এক অনন্য রসের ধারায় আমরা নিমজ্জিত। নারীর প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়কে নাসরিন এক অনন্য মাত্রা দান করেছেন তীব্র ও সোচ্চার ভাষায়। তিনি বলেছেন, -

“অত্যন্ত সচেতনভাবে পুরুষের ওপর মেয়েদের নির্ভর করানো হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পিতার কন্যারা অথবা স্বামীর বধূরা দু’চারটে আত্মীয়র বাড়ি আর মার্কেট ঘোরাঘুরি করেই ভাবে ‘নারী স্বাধীনতা’ হয়ে গেল।”^২

নারীরা যেটাকে স্বাধীনতা ভাবে তসলিমা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন আসলে সেটা মেকী স্বাধীনতা। তসলিমা নাসরিন নারীকে বাহ্যিক দিক থেকে নয়, হৃদয়ান্ত্রিত হৃদয়ঙ্গম থেকে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে বলেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন স্বাধীন যা এক লেখায় তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়, -

“আমি জানি, খুব ভালো করেই জানি, আমার ইচ্ছেগুলো ঘটাতে গেলে আমাকে লোকের ঢিল, থুতু, গা-ধাক্কা খেতে হবে। আমাকে অপদস্থ হতে হবে, ধর্ষিতা হতে হবে। আমাকে কেউ ‘পাগল’ বলবে কেউ ‘নষ্ট’ বলবে, কিন্তু সকলে নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবেন, কোনও পুরুষের বেলায় এ-ধরনের ইচ্ছেকে পূর্ণতা দিতে গেলে অশ্লীল বাক্যবাণে তাঁকে আহত হতে হয় না।”^৩

তিনি নিজেকে এই সমাজের চোখে নষ্ট বলেছেন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বলেছেন, নারীর শুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্ত নষ্ট হওয়া। ‘নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য’ রচনায় তিনি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুর্দশা দুর্ভোগ এর কথা শুধু জানাননি, তিনি এই অবস্থা থেকে উত্তরণের দিক নির্দেশ করেছেন। এই রচনার আর এক অংশে তিনি বলেছেন, -

“নারীর এত ইচ্ছা থাকতেই নেই, নারীকে ঘরে বসে থাকতে হয়, নারীর জন্যে ঘরের দেওয়ালে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা আছে, ওই ভেন্টিলেটর ফুঁড়ে যে আলো হাওয়া তার গায়ে এসে লাগে, সেটিই কি যথেষ্ট নয় বেঁচে থাকবার জন্য?”^৪

তসলিমা নাসরিন শুধু নারী স্বাধীনতার কথা সোচ্চার করে ঘোষণা করেননি, তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার তথা তাঁর মেয়েবেলা কেমন ভাবে কেটেছে তার জীবন্ত প্রমাণ পাই তাঁর ‘আমার মেয়েবেলা’ রচনাংশে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক পরিবেশের দোলাচলতায় এক মেয়ের বেড়ে উঠার কাহিনী। বাবা মায়ের সারহীন সংসার জীবন, যেখানে ছোটো থেকেই তাকে শেখানো হচ্ছিল মেয়ে মানুষকে কি করা উচিত আর কি উচিত নয়। সেখানে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

তাকে বারণ করা হচ্ছে ঘরের বায়রে বেরোতে, মেয়েদের চলাফেরা নাকি সমাজ পরিকল্পিত নির্দিষ্ট সীমানার আসড়ে বদ্ধ। তিনি লিখেছেন তাঁকে বলা হচ্ছে, -

“ছটকু যাইতে পারব, তুমি না। তুমি মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষের দোকান যাইতে নাই।”^৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য পরিবারের অন্যদের সঙ্গে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে নয় বছর বয়সে তাকে শহরে চলে আসতে হয়েছিল। তখন তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর চারপাশের ভয়াবহ রূপের চিত্র। মুক্তদৃষ্টি যুক্তিবাদী বাবার স্বলন, স্নেহশীল ধর্মপ্রাণ মায়ের ধর্মকে অবলম্বন করে অন্ধকার পথে অগ্রসর হওয়া, দাদার প্রেম, বয়স্ক ও আত্মীয়দের কাছে যৌনলাঞ্ছনার লজ্জা অপমান, শাস্ত্র আর ধর্মের নামে পীর আমির উল্লাহর অনাচার প্রমুখ সমাজের নোংরা চিত্র যেন তাকে খুব ছোটবেলা থেকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। ‘আমার মেয়েবেলা’ রচনায় প্রতিভাষিত হয়েছে তসলিমা নাসরিনের তীক্ষ্ণ ধারালো বঝঝকে ভাষা, জীবন্ত মানুষ যা ক্রমশ মৃতপ্রায় মানুষের কথা যা কলমের জাদুস্পর্শে হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার যাত্রা। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, -

“আমার জন্মের আগে দুটো ছেলে জন্মেছিল মার, ছেলে জন্মেছিল বলে রক্ষা। তা নইলে বংশের বাতি কে জ্বালাতো। মেয়েরা তো আর বংশের বাতি জ্বালানোর জন্যে নয়। মেয়েরা ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য, সংসারের কাজে মা’কে সাহায্য করার জন্য, ঘরদোর সাফ রেখে ঘরের পুরুষের মনোতৃপ্তি করার জন্যে।”^৬

তসলিমা নাসরিন এখানে স্পষ্ট করে তুলেছেন সমাজ ও সংসারে নারীর অবস্থানকে, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন, তাঁর বাবা তাঁর মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন নারীর সীমানার কথা।

“ঘরে বইসা পুলপান মানুষ কর। স্বামীর যত্ন নেও। মাইয়ামানুষের অত-নেকাপড়া করার দরকার নেই।”^৭

তিনি এখানে দেখিয়েছেন তাঁর মায়ের মেয়ে মানুষ হওয়ার দুর্দশার কথা। মায়ের একাকিত্ব, সারহীন সংসারে মায়ের কাজ ছিল শুধু সন্তানাদি পালন করা। সমাজ মেয়েদের ওপর কতগুলি সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়া জাল আরোপ করেছেন যা আজও হিন্দু-মুসলিম প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে নারীরা সেই বেড়া জাল থেকে মুক্ত নয়।

তসলিমা নাসরিনের আর একটি নারীবাদী রচনা হচ্ছে ‘শোধ’ গল্প, যেখানে বুমুর বলেছেন, -

“ভালোবেসে বিয়ে তো আমিও করেছি, সংসার তো নিপুণ হাতে আমিও করছি, পান থেকে চুন খসতে দিচ্ছি না, স্বামীর আদেশমতো পছন্দ মতো জীবনের প্রতিটি দিন চলছে, দিন কেন প্রতিটিবেলা চলছে, প্রতিটি মুহূর্ত, তবে এই বৈষম্য কেন!”^৮

এই গল্পে আমরা দেখতে পাই হারুন আর বুমুরের এক কাহিনী। বিয়ে করে তারা বেঁধেছিল স্বপ্নের ঘর, কিন্তু সেই ভালোবাসার হয়েছিল মর্মান্তিক পরিস্থিতি। যেখানে হারুন বুমুরকে বলে যে, বুমুর এর আগের জীবন আর নেই বিয়ের পর বুমুরকে চলতে হবে হারুনের ইশারায়, -

“বিয়ে কিন্তু জীবনকে পালটে দেয়। নতুন অনেক কিছুর অভ্যাস তোমাকে করতে হবে।”^৯

নতুন অভ্যাস, নতুন নিয়ম, নতুন বিধিনিষেধ সমস্ত কিছু মেয়ে জাতির ওপর। বুমুরের যে এক অস্তিত্ব আছে, এতদিন যে বাড়িতে বাবা মায়ের আশ্রয়ে মানুষ হয়েছে, হারুনের কাছে তা সব অতীত। বুমুরের শরীর এর অস্তিত্ব শ্বশুর বাড়িতে অতটা গ্রহণযোগ্য নয়, -

“আমার খাওয়া না খাওয়া এ বাড়িতে বড় কোন ঘটনা নয়। হারুন যদি না খায় তবে সেটি ঘটনা। হারুন যদি মন খারাপ করে, সেটি ঘটনা। আমার পেটে হারুনের বাচ্চা এলেও ঘটনা নয়।”^{১০}

গল্পের পটভূমিতে দেখি, ভালবাসা বড়, কিন্তু আপন সত্তার প্রতি সম্মান কি ভালবাসার চেয়ে বড় নয়? বুমুরের প্রথম সন্তান হারুন নষ্ট করে দিয়েছে। গল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ে দেখি হারুন আর বুমুরের ভালবাসা হয়ে উঠেছে প্রতিশোধের ইচ্ছা। যা এসেছিল বুমুরের মধ্যে। হারুনকে ভালবেসে তার প্রত্যেক অপমানের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত শোধ রচনা করেছিল বুমুর।

তবে তার প্রত্যাঘাত নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে নয়, বজ্রকঠিন প্রত্যয়ী অস্বীকার দিয়ে। হারুনকে ঝুমুর দেখে শুধু বিছানার মধ্যে,

“আমি লক্ষ করি, হারুনের সঙ্গে শারীরিক এই মিলনে আমি কোনও শীর্ষ সুখ পাই না। গর্ভপাতের পর থেকেই এমন হচ্ছে...খুব গোপনে গোপনে এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর মানুষটিকে সে ঘৃণা করে।”^{১১}

হারুনের প্রতি ঝুমুরের এই ঘৃণাবিদ্বেষ যেন সমাজের নগ্নতার এক রূপ। হারুন এবং ঝুমুরের ভালবাসা পর্যবসিত হয়েছে রাতে বিছানায়, যা পতিত বেশ্যালয়ের নামান্তর।

“বিছানায় এলে হারুন আমার কাপড় চোপড় পরা শরীরের ওপরই চড়ে বসে, পরনে শায়াটি ওপরে তুলে দ্রুত সঙ্গম সারে। সেরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, একটি বাচ্চা আমার চাই, একটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা। আমি স্নান কর্তে বলি, তোমার বাচ্চা চাই, প্রতিরাতে তাই আমাকে চাই তোমার, তাই বুঝি তুমি আমাকে যেতে দাও না! হারুন দাঁতেরদাঁত চেপে বলে, ওয়ারি যাওয়ার নাম করে বাবু নামের একশো একটা ছেলের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে চাইছ তো। তা আমি হতে দেব না।”^{১২}

রচনার প্লটে আমরা দেখতে পাই স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে একটা নিম্ন মানসিকতার আধারে, রচনার শেষাংশে দেখা যায় ঝুমুর এর মুখে প্রতিবাদধ্বনি -

“এই প্রথম নিজেকে খুব শক্তিশালী বলে মনে হয় আমার। এই প্রথম আমি অনুভব করি, আমি একজন মানুষ, একজন আলাদা মানুষ, আমি কেবল হারুনের স্ত্রী বা আনন্দের মা, বা শাশুড়ির বউমা, দোলন হাসান আর হাবিবের ভাবীই নয়, আমার কেবল বাবা মার কন্যা, নূপুরের বোন নই, আমি জিনাত সুলতানা ঝুমুর, আমি শিক্ষিকা। আমি কোন ফেলনা কিছু নই, আমি কোনও বস্ত্র নই, ঘর সাজাবার বা সংসার সাজাবার জিনিস নই, আমি একজন মানুষ এবং এই সমাজকে দেবার আমার অনেক কিছু আছে, আমার ভেতর শক্তি আছে, আমার সামর্থ্য আছে।”^{১৩}

তসলিমা নাসরিনের একটি বিতর্কিত রচনা হল— ‘লজ্জা’ এখানে বর্ণিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, যার শিকার হয়েছে নিরীহ মানুষ। বাংলাদেশে সেসময়ে দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় উন্মত্ততার প্রতিক্রিয়া। এই গ্রন্থটি ছোট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইটি নিষিদ্ধ হয়। কারণ তসলিমা নাসরিনের কলমে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে সম্প্রদায় মৌলবাদীদের ওপর তীব্র আক্রমণ, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ঘটে যাওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জীবন্ত কাহিনী। সেখানে তিনি বলছেন, -

“মসজিদ ভাঙলে ওদের রাগ হয়, মন্দির ভাঙলে যে হিন্দুদের রাগ হয় এটা কি ওরা জানে না? নাকি বোঝে না? একটা মসজিদের জন্য ওরা শ’য়ে শ’য়ে মন্দির ভাঙছে। ইসলাম না শান্তির ধর্ম?”^{১৪}

রচনায় দেখা গেছে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। এই রচনায় সুরঞ্জন এর ধর্ম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না, ধর্মীয় মৌলবাদীদের উন্মত্ততায় তাকে হতে হয় গৃহহারা, বন্ধুত্বহীন। শেষ পর্যন্ত এক তিক্ত নৈরাশ্যময় জীবনে সে এগিয়ে যায়। রচনার শেষে সুরঞ্জনের মুখে ফুটে ওঠে—

“আমরা কি আদর্শ বিসর্জন দেব? আদর্শ আবার কি? বোগাস জিনিস।”^{১৫}

এটি ছিল তসলিমা নাসরিনের সাড়া জাগানো এক রচনা।

‘ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে’ তসলিমা নাসরিনের একটি অনন্য রচনা। ময়মনসিংহ শহরের গা ঘেঁষে ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে শৈশব ও কৈশোর শেষ করে দুই বোন যমুনা ও নূপুর। জীবনের প্রয়োজনে যমুনা চলে যায় কলকাতায় আর নূপুর আমেরিকায়। যমুনার মৃত্যুর পর নূপুর তার স্মৃতির চোখে তার বোন যমুনার জীবন সংগ্রাম ও যমুনার প্রতি অবিচারের গল্প বর্ণিত হয়েছে। এ গল্প একটা ভাঙা পরিবারে নারী কেন্দ্রিক গল্প, যে পরিবারে যমুনার জায়গা হয়নি। যমুনা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের মত সে বেঁচেছে মরেছে।

“হিমঘরে শুয়ে আছে যমুনা। চোখের সামনে মৃতদেহ দেখেও নূপুরের মনে হতে থাকে এসত্য নয়। এ ঘটনাই। যমুনা আছে, বেঁচে আছে। কোথাও আছে। এই মৃতদেহ, এই হিমঘর - সবকিছু ঘটেছে হয়তো

অন্য কোথাও, স্বপ্নে অথবা অন্য কোনো জগতে। ... নৃপুর অনুভব করতে থাকে যমুনার স্পর্শ। দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টানা, ভালোবাসায় মমতায় স্নেহে জড়িয়ে রাখা। কতকাল এই স্পর্শ সে পায়নি। কে কবে আর তাকে ওভাবে আলিঙ্গন, যমুনার মতো! জগতটা তারপর হঠাৎ চরকির মতো ঘুরে ওঠ।”^{১৬} এখানে যমুনা বেঁচে থাকতে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাই ছিল অজানা। তার মারা যাওয়ার পর তার অস্তিত্ব কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে নৃপুরকে। এখানে নৃপুরের মা হতে না পারার আক্ষেপ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি যমুনা প্রায় আত্মহত্যা করে তপু (তার নিজের সন্তান) কে নৃপুরের হাতে তুলে দিয়ে নৃপুরের সম্পূর্ণ মা হতে না পারার আক্ষেপ পূরণ করেছে। এ যেন এক অসামান্য নারীর জীবন যাত্রার কাহিনী।

তসলিমা নাসরিনের আর একটি নারীকেন্দ্রিক রচনা হল ‘ফেরা’। এখানে কল্যাণী তার জন্মভূমি, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে চলে এসেছে অন্য জীবনের হাতছানিতে অন্যের হাত ধরে। ছাব্বিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে, বাবা-মা চলে গেছেন, কল্যাণী একবার চোখের দেখাও দেখতে পাইনি। “ ‘নিরাপত্তা’ শব্দটি তাকে ভোগায় বেশ, জন্মের মাটি ছেড়ে, নিজের ঘরবাড়ি চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ফেলে এক অচেনা অদ্ভুত দেশের উদ্ভাস্ত হয়ে কী নিরাপত্তা সে পেয়েছে—”^{১৭} তার জীবনে না আছে পরিচয়, না আছে নিরাপত্তা। সে শুধু অনির্বাক্ত এর স্ত্রী, জয়িষা দীপনের মা, জীবনের মধ্যমপর্যায়ে এসে সে নিজেকে একা মনে করেছে। ফেলে যাওয়া জীবন তাকে পিছু ডাকে। সে ফিরে যেতে চায় আজও ময়মনসিংহে। কিন্তু ফেরা কি সহজ? কেমন চেহারা হবে সেই ফেরার, -

“কল্যাণী আজ তার জন্মের মাটি শুকঁতে এসেছে। সে এই মাটি ফুঁড়ে জন্ম নিয়েছে। কোনও নারীর গর্ভে তার জন্ম হয়নি, সে এই বৃক্ষের মত একা। নিঃসঙ্গ। আর কেউ তাঁকে না চিনুক, বৃক্ষ নিশ্চয় চিনতে পেরেছে। বৃক্ষ তো আর মানুষের মত নিষ্ঠুর নয়। কল্যাণী তার কান্না থামাতে পারে না, সে দীপনের হাত ধরে একঝাঁক তীক্ষ্ণ চোখের সামনে চোখের জলে চোখে নিয়েই রাস্তায় নামে।”^{১৮}

কল্যাণীর নিজ জন্মভূমি ছেড়ে আসা একাকীত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই রচনায়। ‘ফেরা’ তসলিমা নাসরিনের এক মর্মস্পর্শী উপন্যাস। এই মর্মস্পর্শীতা, কাতর আর্তি শুধু কল্যাণীর নয়, ওদেশ থেকে ছেড়ে আসা যে কোনও মানুষের অমোঘ কাহিনী ‘ফেরা’। তসলিমা নাসরিনের প্রত্যেকটি রচনা এক একটি স্বতন্ত্র দলিলের দাবী রাখে, যা কখনও নারীকেন্দ্রিক, কখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আবার কখনও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে।

তসলিমা নাসরিনের ‘নির্বাচিত কলাম’ রচনাটি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধিকার এবং নারী মুক্তির কথা। পুরুষশাসিত সমাজে নারী কেবল ভোগ্য-বস্তু হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তসলিমা বলেছেন, -

“সৎ এবং সততার সঙ্গে ‘সতী’ শব্দটির যদি সামান্য সম্পর্ক থেকে থাকে তবে আমি মনে করি একটি মেয়ে দশটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও ‘সতী’ থাকতে পারে এবং একটি মেয়ে কেবল একটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও সে ‘অসতী’ হতে পারে।”^{১৯}

নারীকেন্দ্রিক তসলিমা নাসরিনের এহেন রচনা যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে দোলায়িত করে তোলে। তসলিমা নাসরিন নারীকেন্দ্রিক প্রসঙ্গে ‘সীতা’কে সতীত্বের পরীক্ষায় পর্যবসিত হতে হয়েছে তা তিনি বলেছেন, -

“আমার মনে হয়, রামই সীতার প্রতি সবচেয়ে অবিচার করেছে, এত অন্যায় পাষাণ্ড রাবণও করেনি। রাম কখনও জানতে চায়নি রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করেছে কিনা, কেবল সন্দেহের বশে রাম সীতাকে অপবাদ দিয়েছে। কেবল নারীর ‘সতীত্ব’ নিয়ে তুমুল হৈ চৈ অথচ সতী শব্দের কোনো পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই। তাই দীর্ঘ বিচ্ছেদের সময় রাম কি করেছে, কাকে ছুঁয়েছে বা কেউ তাকে ছুঁয়েছে কি না এ প্রশ্ন করবার স্পর্ধা কারো ছিল না।”^{২০}

যে সমাজে মা সীতাকে তাঁর সতীত্ব পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সে সমাজে সামান্য নারীরা কীভাবে মর্যাদা পাবে? রচনার শেষাংশে তসলিমা বলেছেন, -

“এখানে নারী একক একব্যক্তি হিসেবে, পৃথক একটি মানুষ হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপন করবার আধিকার অর্জন করেনি। তার জন্ম কারো ‘বংশরক্ষা’ করেনা। নারীর জন্ম কোনো উপার্জনের

উৎস নয়। নারী কেবল পুরুষের লালসা নিবারণ করবে এবং তাকে পুত্র সন্তান উপহার দেবে। এই সব বদ্ধমূল সংস্কার উপড়ে ফেলে নারী যদি মানুষ হিসাবে একাকী না দাঁড়ায় তবে সংস্কারের কেবল বিস্তারই হবে, বিনাশ নয়।”^{২১}

নারীর যাবতীয় বিচরণ ক্ষেত্রে কীভাবে নিহিত পুরুষের লালসা, নীচতা, হিংস্রতা ও আধিপত্য, চাতুরি ও দখলদারির মনোভাব— দুঃসাহসিক ভাষায় নিজের মতামতকে ব্যক্ত করেছেন তসলিমা নাসরিন এই গ্রন্থে।

পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থা এদুয়ের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যচর্চা শুরু। তিনি চান নারীদের জীবন ইতিহাসের কলম পুরুষরা নয় বরং নারীরা চয়ন করবে। ‘নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য’ রচনায় তিনি বলেছেন, -

“নারী শিক্ষিত হোক, স্বনির্ভর হোক। তবেই সে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। সে তার প্রাপ্য অর্জনের জন্য উদ্যোগী হবে। তা নাহলে কী তার প্রাপ্য এবং কী নয় তা সে নিজেই জানবে না। যা অধিকাংশ নারীই এখন জানেনা।”^{২২}

বিজ্ঞানমনস্ক লেখিকা মনে করেন ধর্ম, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মীয় মৌলবাদ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর রচনা নারী চেতনার সার্থক দলিল হয়ে উঠেছে। বিলাসী উপভোগ্যতা তাঁর রচনায় স্থান পায়নি। তাঁর রচনা হচ্ছে বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী নিষ্পেষণ। দুঃসাহসী, স্পষ্টবাক ও প্রতিবাদী তসলিমা নাসরিনের রচনা সমাজের কাছে বিস্ফোরক। এই বিস্ফোরণে খুলে গেছে কত নামীদামী ধনী কিংবা বুদ্ধিজীবী পুরুষ-জাতির মুখোশ। তসলিমা নাসরিনের লেখনী শৈলীর এখানেই সার্থকতা। তাঁর শতায়ু কামনা করে বলা যেতে পারে যে, তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী ধারা এমন ভাবে যেন আগামীর ছদ্মবেশী সমাজের মুখোশ খুলে ফেলতে পারে, যা ঘুমিয়ে থাকা জাতিকে জাগ্রত করতে সহায়তা করবে।

Reference:

১. নাসরিন, তসলিমা, ‘নির্বাচিত কলাম’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৭, পৃ. ৭৭-৭৮
২. তদেব পৃ. ১৩
৩. নাসরিন, তসলিমা, ‘নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য’, আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ৯
৫. নাসরিন, তসলিমা, ‘আমার মেয়েবেলা’, পিপলস বুক সোসাইটি, নবম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ২৩
৭. তদেব, পৃ. ২৭
৮. নাসরিন, তসলিমা, ‘শোধ’, আনন্দ পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. ৯
৯. তদেব, পৃ. ২৮
১০. তদেব, পৃ. ৪৩
১১. তদেব পৃ. ৬৩
১২. তদেব, পৃ. ৯১
১৩. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৪. নাসরিন, তসলিমা, ‘লজ্জা’ আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চদশ মুদ্রণ অগাস্ট ২০১২, পৃ. ৪৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৪৩
১৬. নাসরিন, তসলিমা, ‘ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে’, সাহিত্যম পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৩৩
১৭. নাসরিন, তসলিমা, ‘ফেরা’, আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ১৫
১৮. তদেব, পৃ. ৬৩

১৯. নাসরিন, তসলিমা, 'নির্বাচিত কলাম', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৭, পৃ. ১৭
২০. তদেব, পৃ. ৭১
২১. তদেব, পৃ. ১৯০
২২. নাসরিন, তসলিমা, 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য', আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৭৭

Bibliography:

- ভট্টাচার্য, রূপা, 'মেয়েদের কবিতা : আরেক পৃথিবী, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩
- ভট্টাচার্য, সুতপা, 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য আকাদেমি, নিউ দিল্লী ২০১৪
- চৌধুরী, সেন স্বাতু, 'নারীদের নানা পাঠ' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০২১
- মুখোপাধ্যায়, তরুন, 'ওপার বাংলার কবিতা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০০৭